ইউনিট ৪
মাছ ও চিংড়ি রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ

ইউনিট ৪ রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ

মাছ ও চিংড়ি উভয়ই বাংলাদেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ-সম্পদ। এদের উৎপাদনের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রোগ অন্যতম। রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে না বাঁচাতে পারলে মাৎস্য সম্পদের সীমাহীন ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাছ ও চিংড়ি উভয় সম্পদের রোগের প্রভাবে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এদেশে মাছের ক্ষেত্রে ক্ষতরোগ (Epizootic Ulcerative Syndrome, সংক্ষেপে EUS) এবং চিংড়ির ক্ষেত্রে সাদা দাগ (White Spot) রোগ মহামারী আকারে চিহ্নিত হয়েছে। চিংড়ি উৎপাদনে সাদা দাগ বিশিষ্ট ভাইরাস রোগটিতে ১৯৯৪ সন থেকে এ যাবৎ প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে। তদ্রূপ ১৯৮৮ সন থেকে ক্ষতরোগের ফলে মাছের উৎপাদন সাংঘাতিক ভাবে ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে ক্ষতরোগের প্রকোপ কিছুটা কম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উপরিউল্লিখিত দুটো মহামারী রোগ ছাড়াও অন্যান্য ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পরজীবী ঘটিত রোগও মাঝে মাঝে মারাত্মক আকার ধারণ করে। সময় মত এরোগ গুলো চিহ্নিত করতে না পারলে প্রয়োজন মত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে সাধারণ রোগও অনেক সময় নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। যদিও মানুষ কিংবা গৃহপালিত পশুর মত মাছ কিংবা চিংড়ির রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত তত উন্নতি লাভ করে নাই, তথাপি উৎপাদনের উন্নতির লক্ষ্যে এদের রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য, দমন ও প্রতিরোধের নিয়মাবলী, বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণু ঘটিত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি এবং ক্ষতরোগের প্রতিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

পাঠ ৪.১ রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য, দমন ও প্রতিরোধের নিয়মাবলী

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রোগ প্রতিরোধ করার নিয়মাবলী লিখতে ও বলতে পারবেন।
- রোগ দমন করার নিয়মাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য

আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মেটানো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন। আধুনিক ও লাগসই মাৎস্য চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের উন্নয়নের সহজ আর কোন বিকল্প নেই। আর এ প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তবে বিগত বছরগুলোতে লক্ষ্য করা গেছে যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এক দিকে যেমন মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বেড়েছে অন্যদিকে আবার নূতন নূতন রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটেছে। কাজেই মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদের পারিবেশিক অবস্থার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে রোগ বালাই যাতে না হয় তার জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়াই হল রোগ প্রতিরোধের প্রধান উদ্দেশ্য।

রোগ বালাই যাতে না হয় তার জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়াই হল রোগ প্রতিরোধের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত মূলনীতি হল "চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধই উত্তম পন্থা"।

মৎস্য সেক্টরে মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি সাধারণ মূলনীতি প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে, "চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধই উত্তম পন্থা" (Prevention is better than cure)। আর এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা- যেমন বড় আকারের পুকুরে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় না করে চিকিৎসা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না, তা ছাড়া পারিবেশিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং খরচের পরিমাণও অনেক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পক্ষান্তরে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাছ বা চিংড়ির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ সহ নিয়মিতভাবে সাধারণ ব্যবস্থাপনার দিকে সতর্ক থাকলেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

রোগ প্রতিরোধের নিয়মাবলী

রোগ প্রতিরোধের প্রধান শর্ত হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থাপনা। যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার দ্বারা মাছ ও চিংড়ি উভয়ের রোগসমস্যা থেকে বাঁচা সম্ভব। এজন্য পোনা উৎপাদন বা সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাজারে বিক্রয় পর্য্যন্ত যে সকল ধাপ রয়েছে তার সর্বক্ষেত্রে সতর্কতার সংগে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। চিত্র: ১৪ থেকে ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো সহজেই মনে রাখা যাবে।

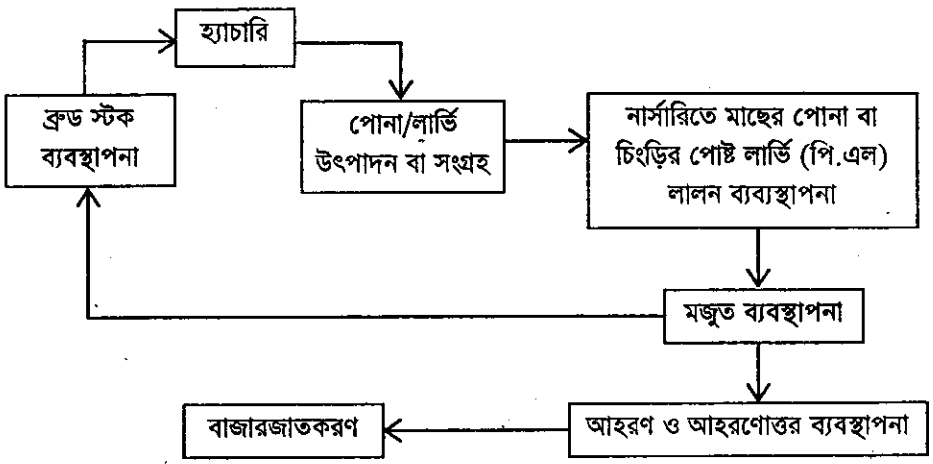

চিত্র ১৪ : মাছ বা চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ধাপগুলোর ছক

উপরিউল্লিখিত ধাপগুলোর জন্য বিশেষ করে হ্যাচারী, নার্সারী এবং মজুত পুকুর বা জলাশয়ের পারিবেশিক অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের দ্বারা সদা সুব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে-

১) পানির গুণাগুণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয়।
২) জলাশয় আগাছামুক্ত রাখা এবং পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ার ব্যবস্থা করা।
৩) ৩/৪ বছর পরপর পুকুর শুকিয়ে উপরের কাদা সরিয়ে ফেলা। চিংড়ি ক্ষেত্রে একাজ প্রতি বছর করতে পারলে ভাল হয়।
৪) পুকুর থেকে অবাঞ্ছিত প্রাণী অপসারণ করা।
৫) উন্নত জাতের সুস্থ, সবল এবং সঠিক সংখ্যক পোনা মজুত করা।
৬) পুকুরে পরিমিত খাদ্য ও সার সময়মত সরবরাহ করা।
৭) পুকুরে রোগজীবাণু বাহক পাখি বসতে না দেয়া।
৮) রোগাক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জাল জীবাণুমুক্ত না করে নূতন পুকুরে ব্যবহার না করা।

এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য ভ্যাক্সিন (Vaccine) ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে পৃথিবীতে এর এখনও বহুল ব্যবহার হয়নি। মাছের রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ফুরানকুলোসিস, ভিব্রিওসিস রোগের ক্ষেত্রে নরওয়ে, বৃটেন, ডেনমার্ক সহ ইউরোপের কিছু দেশে, উত্তর আমেরিকা এবং জাপানে ভ্যাক্সিন ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে সাফল্যজনক ভাবে ব্যাপক প্রচলন এখনও হয়নি। মৎস্য রোগ বিশেষজ্ঞগণ কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাছে ইমিউনোষ্টিমুল্যান্ট ব্যবহার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

রোগ দমনের নিয়মাবলী

রোগ দেখা দেওয়ার পর যে প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা-ই হল রোগ দমন। এর জন্য শর্ত হল রোগের কারণ নির্ণয়। আর উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে এর চিকিৎসা করা হয়- যাকে কেমোথেরাপি বলা হয়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যখন রোগ দেখা দেয় তখন তা থেকে মাছ বা চিংড়িকে রক্ষা করার যে সকল ব্যবস্থা হয় তাকেই সাধারণ ভাবে দমন ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। প্রতিকার ব্যবস্থা এর অন্তর্গত। বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসাই হল রোগ দমনের প্রধান নিয়ম। নিম্নে রোগ দমনের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করা হল। প্রতিকারের একটি প্রধান শর্ত রোগের কারণ সঠিকভাবে জানা।

১। রাসায়নিক চিকিৎসা (Chemotherapy)

বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে যে চিকিৎসা করা হয় তাকেই রাসায়নিক চিকিৎসা বলা হয়। এ সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদির মূল্য সহজ লভ্যতা, পানির পরিবেশে প্রভাব, রোগ প্রতিকারের কার্য্যক্ষমতা, মাছ বা চিংড়ির উপর প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তীতে বাজারজাত করণে গ্রহনযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সকল দ্রব্য চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বহিঃপরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হলে পোকামারার ঔষধ(Insecticide), ছত্রাক দ্বারা হলে ছত্রাক মারার ঔষধ(Fungicide) আর ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আকান্ত হলে এন্টিবায়োটিক(Antibiotics) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রোগের তীব্রতা, প্রসারতা বা অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঔষধ (রাসায়নিক দ্রব্য) প্রয়োগের কতগুলো নিয়ম রয়েছে- এ গুলো নিম্নে দেয়া হলো।

ক) পুকুরে প্রয়োগ (Pond treatment) ঃ পুকুরে যখন অল্প মাছে রোগ দেখা দেয় কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাপক হারে রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন সীমিত মাত্রার ঔষধ সমস্ত পুকুরে নিয়মিত ২/৩ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হয়।

খ) গোসল (Bath treatment) ঃ রোগাক্রান্ত মাছকে আলাদা করে অন্য ছোট ট্যাংক, চৌবাচ্চা, ড্রাম বা একোরিয়ামে কমপক্ষে আধ ঘন্টা থেকে ১/২ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ দ্রবনে রাখা। এতে তুলনামূলক ঔষধের মাত্রা কম থাকে বা মাছের সহ্যক্ষমতার মধ্যে থাকে। সময় অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ গোসল করে রোগ প্রতিকার করা যেতে পারে।

গ) **চুবানো** (Dip treatment) ঃ স্বল্প সংখ্যক রোগাক্রান্ত মাছকে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে (১ থেকে ৩ মিনিট) অপেক্ষাকৃত ঘন ঔষধ দ্রবণে ডুবানো। অনেক সময় এতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ঘ) লাগানো (Topical application) ঃ মাছের শরীরের উপরিভাগে কোন ক্ষত, আঘাতজনিত স্থানে সরাসরি ঔষধ লাগিয়ে দেওয়া।

ঙ) খাবারের মাধ্যমে বা মুখের দ্বারা (Oral administration) ঃ নির্দিষ্ট মাত্রায় খাবারের সাথে মিশে ঔষধ ব্যবহার বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ খুবই কার্য্যকরী।

চ) **ইনজেকশনের মাধ্যমে** (Injection) ঃ ইনজেকশনের দ্বারা ঔষধ সরাসরি রক্তের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থানে পৌছে যায় তাই এই পদ্ধতি বেশ কার্যকরী। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক বড় মাছ ছাড়া ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা যায় না। বড় মাছের ক্ষেত্রে পেটের তলদেশে (Interperitoneal) বা ঘাড়ের মাংশপেশীতে (Intermuscular) ইনজেকশন ব্যবহার করা সম্ভব।

Chemotherapy ছাড়াও শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে, পানির তাপমাত্রা পরিবর্তন বা সমুদ্রের পানি দিয়ে মাছের রোগ প্রতিকার করা যায়।

২। সার্জারী (Surgery)/শৈল্য চিকিৎসা

ঔষধ ছাড়াও কিছু অন্য উপায়ে চিকিৎসা কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে- তার মধ্যে শরীরের উপরিভাগে আক্রান্ত কোন পরজীবী অপসারণ কিংবা আঘাত প্রাপ্ত কোন পাখনা বা বংশানুক্রমিক কোন অতিরিক্ত অথবা অস্বাভাবিক অংগকে অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

৩। বিবিধ উপায় (Miscellaneous treatment)

অনেক ক্ষেত্রে সামুদ্রিক পানিকে স্বাদু পানির মাছের রোগ দমনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কলামনারিস রোগ (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত), ছত্রাক ঘটিত রোগ এদের মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য। এ ছাড়া পানির তাপমাত্রা পরিবর্তনের দ্বারাও অনেক রোগজীবাণু দমন করা যায়- ফলে রোগ বিস্তার করতে পারে না।

অনুশীলন (Activity) : *মৎস্য চাষে রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য কি? মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ও দমনের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করুন।*

সারমর্ম ঃ মাছ ও চিংড়ি চাষে রোগ-বালাই একটি প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হল প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া। মৎস্য চাষে রোগ বালাই থেকে বাঁচার জন্য পারিবেশিক অবস্থার উত্তম ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনে সম্ভব হলে ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে মাছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, পুকুর বা জলাশয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক পোনা না ছাড়া ইত্যাদি প্রতিরোধ করার নিয়ম। এর ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে, স্বল্প খরচে রোগ নিয়ন্ত্রন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত মূলনীতি হল, "চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধই উত্তম পন্থা" (Prevention is better than treatment)। অবশ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার পরও রোগ দেখা দেয় তখন চিকিৎসার মাধ্যমে দমন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। রোগ প্রতিকার করার প্রধান উপায় হল রাসায়নিক দ্রব্যাদি সঠিকভাবে ব্যবহারের দ্বারা চিকিৎসা করা যাকে রাসায়নিক চিকিৎসা (Chemotherapy) বলা হয়। পোকামারা ঔষধ (Insecticide), ছত্রাক মারা ঔষধ (Fungicide), এন্টিবায়োটিক সহ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা হয়। আবার ঔষধ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরে প্রয়োগ, গোসল, চুবানো, লাগানো, মুখের দ্বারা এবং ইনজেকশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও শৈল চিকিৎসা, পানির তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে বা সামুদ্রিক পানি ব্যবহার করে অনেক রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক) ইনসেকটিসাইড দ্বারা কী ধরনের রোগ জীবাণু মারা হয়?
- i) ব্যাকটেরিয়া
- ii) ছত্রাক
- iii) ভাইরাস
- iv) পোকা জাতীয় জীবাণু

খ) ঔষধ প্রয়োগের জন্য কোন পদ্ধতিতে চিকিৎসা উত্তম?
- i) পুকুরে প্রয়োগ
- ii) গোসল
- iii) চুবানো
- iv) লাগানো

২। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি"' লিখুন।

ক) মাছের রোগ বালাই থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরোধ পদ্ধতিই উত্তম।

খ) রোগের কারণ নির্ণয় রোগ প্রতিরোধের প্রধান শর্ত।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) চিংড়ির মহামারীর নাম ---------- ।

খ) এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হয় ---------- এর বিরুদ্ধে।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক) রাসায়নিক চিকিৎসাকে ইংরেজিতে কী বলা হয়।

খ) রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী ব্যবহার হচ্ছে।

পাঠ ৪.২ পরজীবী, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ ও চিংড়ির পরজীবী ঘটিত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি লিখতে ও বলতে পারবেন।
- ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভাইরাস ঘটিত রোগের প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখতে ও বলতে পারবেন।

মৎস্য রোগের প্রতিকার করতে সাধারণতঃ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে চিকিৎসা করা হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। তবে এ ক্ষেত্রে যত কম খরচে এবং কম মাত্রার ঔষধ ব্যবহার করা যায় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্য নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার না করে যাতে এক ঔষধের দ্বারা একাধিক রোগ বা একজাতীয় রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগের চিকিৎসা করা যায় তার পদ্ধতিই উত্তম পদ্ধতি। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

পরজীবী, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার সাধারণত রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে (Chemo-therapy) করা হয়। এক্ষেত্রে কম খরচ এবং লাগসই রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা অপরিহার্য্য।

পরজীবীজনিত রোগের প্রতিকার

মাছের পরজীবী অনেক থাকলেও বাংলাদেশে পরজীবীজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব তেমন প্রকট নয়। চিংড়ির ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই বললেই চলে। যা হউক যে সকল পরজীবীজনিত রোগ মৎস্য চাষে সমস্যা করে তার অধিকাংশই বহিঃ পরজীবীর আক্রমণে হয়। এগুলোর মধ্যে এককোষী পরজীবী এবং কিছু বহুকোষী পরজীবীর আক্রমণজনিত রোগই প্রধান। নিম্নে এদের প্রতিকার পদ্ধতি উল্লেখ করা হল-

মাছের সাদা দাগ রোগ (White spot) ও ট্রাইকোডাইনিয়াসিস (Trichodiniasis), কসটিয়াসিস (Costiasis)

এ রোগগুলো এককোষী পরজীবী দ্বারা হয়। কার্প জাতীয় এবং ক্যাট ফিশ (মাগুর, পাংগাস) মাছে এদের আক্রমণ হতে পারে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ৩.২ পাঠে রয়েছে। এ গুলো মাছের ত্বক, লেজ, পাখা ও ফুলকায় আক্রমণ করে। আক্রান্ত মাছকে আলাদা পাত্রে ৫০ পি.পি.এম ফরমালিন, অথবা ১.০ পি.পি.এম. তঁতে (Copper sulphate) বা ২.৫% লবণ দ্রবণে যতক্ষণ মাছ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ গোসল করাতে হবে। এর পর পরিস্কার পানিতে কিছুক্ষণ চুবানোর পর মজুদ পুকুরে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তবে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে পড়লে সপ্তাহে ২০-২৫ পি.পি.এম হারে পুকুরে ফরমালিন প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ভাল ফল পাওয়ার আশা করা যায়। এ ছাড়া ৩-১০ পি.পি.এম আকরিফ্লাভিন এর মধ্যে আক্রান্ত মাছকে দীর্ঘক্ষণ গোসল করালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মনোজেনেটিক ট্রিমাটোডের আক্রমণঃ গিল ও স্কীন ফ্লুক, টুইন ওয়ার্ম (Dactylogyrosis, Gyrodactylosis, Diplozooniasis)

এ রোগগুলো জন্য ও উপরিউল্লিখিত ফরমালিন চিকিৎসা করা যেতে পারে। এ ছাড়া ডিপটারেক্স ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অল্পমাত্রায় মিশ্রিত করে (০.৩ পি.পি.এম ডিপটারেক্স ও ৩ পি.পি.এম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) পুকুরে প্রতি সপ্তাহ একবার করে দু সপ্তাহ যাবৎ প্রয়োগ করলে ব্যাপক আক্রমণ দমন করা সম্ভব হয়।

এরগাসিলোসিস (Ergasilosis), আরগুলোসিস (Argulosis), লারনিয়াসিস (Lerneossis), জোঁকের আক্রমণ (Leech infection)

এ সকল রোগের মধ্যে আরগুলোসিস মাঝে মাঝে মাছের পুকুরে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। যেহেতু এরা পোকামাকড় জাতীয় পরজীবী ঘটিত রোগ সে জন্য এদের চিকিৎসার জন্য কীটনাশক (Insecticide) ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ডিপটেরেক্স (Dipterex) বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া সুমিথিওন, ম্যালাথিওন বা প্যারাথিওন কেউ কেউ ব্যবহার করেন।

এ ঔষধ প্রয়োগের পদ্ধতিঃ পুকুরে ব্যবহার সর্বোত্তম। ডিপটেরেক্স ০.৩-০.৫ পি.পি.এম প্রতি সপ্তাহে, সুমিথিওন/ম্যালাথিওন/পারাথিওন ০.২৫-০.৩ পি.পি.এম হারে পুকুরে প্রয়োগ সপ্তাহে ১ বার দু সপ্তাহ পর্যন্ত।

ছত্রাক জনিত রোগের প্রতিকার

ছত্রাক জাতীয় রোগে সাধারণত ০.১৫ - ০.২০ পি.পি.এম ম্যালাকাইট গ্রীন পুকুরে প্রয়োগ করতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের মিঠা পানির প্রায় সকল মাছই ছত্রাক রোগে সংবেদনশীল। বিশেষ করে ত্বক ও ফুলকাতে আঘাতজনিত কারণে সহজেই ছত্রাক আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। ত্বকের রোগকে ডারমাটোমাইকোসিস (Dermatomycosis) এবং ফুলকায় হলে ফুলকা পচা রোগ যথাক্রমে স্যাপ্রোলেগনিয়াসিস এবং ব্র্যংকিওমাইকোসিস হিসেবে পরিচিত। যা হউক ত্বক বা ফুলকায় ছত্রাক জাতীয় রোগ হলে সাধারণতঃ "ম্যালাকাইট গ্রীন" দ্বারা চিকিৎসা ফলদায়ক। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে হ্যাচারীতে ডিম বা পোনার আক্রমণে "মিথিলীন ব্লু" ব্যবহার করা হয়। আবার অল্প সংখ্যক মাছের ক্ষেত্রে লবণ দ্রবণে চিকিৎসা করা যায়। এদের প্রয়োগ মাত্রা নিম্নে দেওয়া হল।

ম্যালাকাইট গ্রীন ঃ ০.১৫-০.২০ পি.পি.এম পুকুরে প্রয়োগ প্রতি সপ্তাহে একবার দু থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত চালালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মিথিলীন ব্লু ঃ ০.১০-০.১৫ পি.পি.এম দ্বারা আক্রান্ত পোনা বা ডিম ধৌত করালে, বা দ্রবণে ১-২ ঘন্টা গোসল করালে প্রতিকার পাওয়া যায়।

লবণ দ্রবণ ঃ ২.০-২.৫ শতাংশ লবণে আক্রান্ত মাছকে যতক্ষণ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত মাছকে ০.৫ পি.পি.এম তুঁতে দ্রবণে চুবানোর জন্য উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে তুঁতে খুব বিষাক্ত এবং ক্ষতিকারক তাই যতদুর সম্ভব তুঁতে দ্বারা চিকিৎসা না করানো ভাল। বর্তমানে ক্ষত রোগের প্রধান কারণ এফানোমাইসেস (Aphanomyces) ছত্রাকের আক্রামণে হয় বলে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করছেন। পরবর্তীই পাঠে ক্ষত রোগের প্রতি-ার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের প্রতিকার

কলামনারিসসহ অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়।

মৎস্য চাষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাকটেরিয়াজনিত অনেক রোগের সমস্যা রয়েছে এবং এর প্রতিকারের জন্য অনেক গবেষণাও চলছে। প্রতিকারের জন্য সঠিক ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করতে অনেক সময় লেগে যায়। তবে সচরাচর যে সকল ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ মাছ কিংবা চিংড়ি চাষে দেখা দেয় তার জন্য বিভিন্ন প্রকার "এন্টিবায়োটিক" প্রস্তুত রাখা হয় এবং সময়মত তা খাবারের সংগে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে হারে মাছ ও চিংড়ি চাষ চলছে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভবনা যার প্রচুর, তার রোগ সনাক্তকরণ বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ঘটিত রোগের বিশেষজ্ঞ এদেশে খুবই কম এবং উপযুক্ত গবেষণাগারও অপ্রতুল। সে জন্য অনেক রোগ যা ব্যাকটেরিয়া জনিত তা সঠিক সময়ে সনাক্ত করা যায় না আবার যা ব্যাকটেরিয়া জনিত নয় অথচ তাকে ব্যাকটেরিয়া মনে করে চিকিৎসার দ্বারাও কোন ফল পাওয়া যায় না। যা হউক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত একোয়াকালচার বিভাগে একটি আধুনিক মৎস্য রোগ গবেষণাগার (Fish Disease Lab.) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এখানকার বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের গবেষণা ফল স্বরূপ

কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সনাক্ত করা গিয়েছে - এ ছাড়া বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে যে সকল রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিম্নে দেওয়া হল।

কলামনারিস রোগ ঃ *Flexibacter columnaris* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ কার্প জাতীয় মাছ সহ অন্যান্য স্বাদু পানির মাছে হয়ে থাকে। অনেকে ফুলকা ও পাখনা পচা রোগ বলে থাকে যা প্রধানতঃ এই ব্যাকটেরিয়ার আক্রামণেই ঘটে থাকে। যেহেতু এই ব্যাকটেরিয়া ১% লবণ দ্রবণ সহ্য করার ক্ষমতা নেই বা তাতেই তার মরণ, তাই অনেকে আক্রান্ত মাছকে ১%-২% লবণ দ্রবণে সহ্য করার মত সময় পর্যন্ত গোসল করিয়ে সুফল পায়। এ ছাড়া জাপান বা আমেরিকাতে এ রোগের চিকিৎসার জন্য সমুদ্রের পানি ক্রমশঃ তরল থেকে ঘন স্বাদু পানি মিশ্রিত পানিতে গোসল করিয়ে প্রতিকার করা হয়। যা হউক অন্যান্য বড় প্রাণীর মত মাছও চিংড়ির ব্যাকটেরিয়াজনতি রোগের জন্য লাগসই এন্টিবায়োটিক ব্যবহারই উত্তম প্রতিকার। যেহেতু কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে ব্যাকটেরিয়া চেনা তাৎক্ষনিকভাবে সম্ভব নয় তার জন্য ব্যাপক আরোগ্য সাধন করার ক্ষমতা সম্পন্ন, আবার কম খরচ ও ক্ষতিক্ষারক ক্রিয়া যাতে না করে সে সকল এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উত্তম। কলামনারিস রোগের ক্ষেত্রে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (টেরামইসিন), সালফা ড্রাগস (Sulphamethoxazole, Sulphadiazine), এবং ফুরাসিন (Furacin) ব্যবহার করা যায়। নিম্নে এদের প্রয়োগ মাত্রা সহ চিকিৎসা পদ্ধতি উল্লেখ করা হল।

অক্সিটেট্রাসাইক্লিন/টেরামাইসিন বহুল ব্যবহৃত ঔষধ। দশদিন পর্যন্ত ৭৫ মি.গ্রাম/প্রতি কেজি মাছের জন্য প্রত্যহ খাবারের সংগে মিশিয়ে খাদ্যের সংগে ব্যবহার কর যেতে পারে। আবার ইনজেকশন করলে ১০০ মিগ্রা/প্রতি কেজি মাছের ওজন হিসাবে।

সালফা ড্রাগস ঃ খাবারের সংগে ০.১-০.২ গ্রাম/প্রতি কেজি মাছের ওজনের জন্য ১০ দিন পর্যন্ত দিতে হবে।

ফুরাসিন (নাইট্রোফুরামেন ৯.৩%) ঃ ১ ঘন্টা যাবৎ ১০-১৫ পি.পি.এম দ্রবণে আক্রান্ত মাছ গোসল করাতে হবে। আবার ৫০ মি.গ্রাম/ প্রতি কেজি আক্রান্ত মাছের জন্য ১০ দিন যাবৎ খাবার দিলে আরোগ্য লাভ করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়াল সেপটিসেমিক রোগ

Pseudomonas fluorescens, Aeromonas hydrophila এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত মাছের রক্ত ক্ষরণ সহ নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর মধ্যে ড্রপসি (পেটফুলা) রোগও হতে পারে। এ সকল হলে বা রক্ত সংক্রমিত হলে সাধারণতঃ এন্টিবায়োটিকের চিকিৎসা ছাড়া আর উপায় থাকেনা। তখন উপরিউল্লিখিত ভাবে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে "অক্সোলিনিক এসিড (Oxolinic Acid)" প্রতিদিন ৩ মি.গ্রাম হারে প্রতি কেজি মাছে খাবারের মাধ্যমে ৫ দিন পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে। আবার গোসলের জন্য ১-২ পি.পি.এম এই ঔষধ দ্রবণে ১ দিন পর্যন্ত আক্রান্ত মাছকে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ির ভিব্রিওসিসি রোগ, স্বাদু ও সামুদ্রিক উভয় শ্রেনীর মাছে এডওয়ার্ড সিওলোসিস এবং নাতিশীতোষ্ণ বা শীত প্রধান দেশের মাছের ফুরানকুলোসিস ও ব্যাকটেরিয়াল গিল রোগ, ব্যাকটেরিয়াল কিডনী রোগ (সামুদ্রিক মাছ) চিকিৎসা করা যায়। এ ছাড়া পুকুরের পানিতে অক্সিজেন কম থাকার কারণে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ হলে ২-৫ পি.পি.এম পটাশ (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$) প্রয়োগ করলে কিছু ফল পাওয়া যায়। অল্প সংখ্যক মাছ হলে ১৫-২০ পি.পি.এম পটাশ দ্রবণে এক ঘন্টা পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে। বর্তমানে তুঁতে (কপার সালফেট, $CuSO_4, 5H_2O$) খুব বিষাক্ত হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় সাধারণতঃ ইহার প্রয়োগ পুকুরে একেবারে অনুচিৎ। তবে অল্প সংখ্যক আক্রান্ত

মাছকে আলাদা করে ০.৫-২ পি.পি.এম তুঁতে দ্রবণে ৩০ মিনিট সময় পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে।

ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার

ভাইরাসজনিত রোগের উত্তম প্রতিকার পদ্ধতি এখনও অজানা। তবে কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে এ সকল রোগের প্রতিকার করার চেষ্টা চলছে।

মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনকারী পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ভাইরাস ঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে তা মারাত্মক মড়কের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিজ্ঞানির নানাবিধ গবেষণা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত প্রতিকারের ভাল কোন উপায় বের করা সম্ভব হয়নি। সে জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তম ব্যবস্থাপনা, সংক্রমন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া, রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা যাতে কম হয় তার জন্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রন করা এ ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন (টিকা) দিয়ে বা অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে মাছের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা হয়। নাতিশীতোষ্ণ বা শীত প্রধান দেশে ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব হয় যার মধ্যে আই.পি.এন (ইনফেকশাস প্যাংক্রিয়েটিক নেক্রোসিস), ভি-এইচ.এস (ভাইরাল হেমোরহেজিক সেপ্টিসেমিয়া), আই এইচ এন (ইনফেকশাস হেমাটোপোয়েটিক নেক্রোসিস), লিম্ফোসিসটিস প্রধান। বাংলাদেশে অনেকে ক্ষতরোগের সংগে মিশ্র সংক্রমন করে এমন ধারনা করে থাকে যা পুরাপুরি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি। কার্প জাতীয় মাছে স্প্রিং ভিরেমিয়া নামক রোগের সম্ভবনা রয়েছে। তবে চিংড়ি উৎপাদনে এ দেশে ব্যাপক মড়ক দেখা দেওয়ায় প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে বিগত ৩/৪ বছর থেকে। বর্তমানে যে রোগের প্রধান সমস্যা তা হল সাদা দাগ রোগ (White spot) বা চায়না ভাইরাস রোগ, বৈজ্ঞানিকগণ একে SEMBV (Systemic Ectodermal Mesodermal Baculo Virus) রোগ বলে থাকে। কক্সবাজার থেকে খুলনার পুরা অঞ্চল জুড়ে বাগদা চিংড়িতে এরোগের বিস্তৃতি। থাইল্যান্ড, ভারত, শ্রীলংকাসহ এশিয়ার অনেক দেশেই এর বিস্তৃতি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সাফল্যজনক কোন চিকিৎসা এর বের হয় নি। তবে থাইল্যান্ডে কোন কোন স্থানে পুকুরে ২৫ পি.পি.এম ফরমালিন প্রয়োগ করে কিছুটা উপকার পাওয়া গেছে (নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে)। এ ছাড়াও বাংলাদেশে চিংড়িতে ইয়েলো হেড রোগ (Monodon Baculo Virus Disease-MBV রোগ) বাংলাদেশে ধরা পড়েছে তারও তেমন কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি। মাছের ক্ষেত্রে ভাইরাস সংক্রমন যাতে না হয় তার জন্য ডিম বা পোনার জন্য আয়োডিন জাতীয় ঔষধ (Argentyne) ১০০ পি.পি.এম দ্রবণে আধঘন্টা থেকে দু ঘন্টা পর্যন্ত গোসল বা ধৌত করানো যেতে পারে। এ ছাড়া জাল, পাত্র ও অন্যান্য জিনিষপত্র ১.৫০ ভাগ তরল করে ১০ মিনিট কাল ডুবিয়ে রাখলে ভাইরাস মুক্ত থাকা যায়।

অনুশীলন (Activity): *পরজীবী, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ পরজীবী, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার সাধারণতঃ রাসায়নিক দ্রব্যাদি সঠিক নিয়মে ব্যবহার করে করতে হয় যাকে রাসায়নিক চিকিৎসা বা কেমোথেরাপি (Chemotherapy) বলে। কেবল মাত্র ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি এখন পর্যন্ত কৃতকার্য্যের সহিত উদ্ভাবিত হয়নি। তবে অন্যান্য জীবানু ঘটিত রোগের মধ্যে সাধারণ রোগগুলোর প্রতিকার সাফল্যজনক ভাবে মাছ এবং চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বহিঃ পরজীবীজনিত রোগের চিকিৎসা সাধারনতঃ ফরমালিন, ডিপটেরেক্স দ্বারা করা হয় তবে অন্ত পরজীবীর ক্ষেত্রে ঔষধ তেমন ক্রিয়া করে না। ছত্রাকজনিত রোগের চিকিৎসা সাধারণতঃ ম্যালাকাইট গ্রীন দ্বারা করা হয় আর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের জন্য অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ফুরাসিন প্রভৃতি এন্টিবায়োটিক কার্য্যকরী ভূমিকার জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) কেমোথেরাপি কি?

i) রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
ii) রাসায়নিক চিকিৎসা
iii) একটি ঔষধ
iv) অস্ত্র পাচার

খ) আরগুলোসিস হলে কোন ঔষধটি বহুল ব্যবহৃত হয়?

i) কপার সালফেট
ii) ম্যালাকাইট গ্রীন
iii) পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট
iv) ডিপটেরেক্স

২। **সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।**

ক) ব্যাকটেরিয়াজনিত মাছ ও চিংড়ি রোগের জন্য অক্সিটেট্রামাইক্লিন বহুল ব্যবহৃত হয়।
খ) চিংড়ি সাদা দাগ রোগের জন্য আরজেনটাইন ব্যবহৃত হয়।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক) মাছের সাদা দাগ রোগ ---------- পরজীবী দ্বারা হয়।
খ) আমাদের দেশের ---------- প্রায় সকল মাছই ছত্রাক রোগে সংবেদনশীল।

৪। **এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক) কলামনারিস কি ধরনের রোগ?
খ) SEMBV বলতে কী বুঝায়?

পাঠ ৪.৩ ক্ষত রোগের প্রতিকার

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চুন ও লবণ প্রয়োগে ক্ষত রোগের প্রতিকার করার পদক্ষেপ নিতে পারবেন।
- পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও ম্যালাকাইট গ্রীন ব্যবহার করে মাছের ক্ষতরোগ প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারবেন।
- ক্ষতরোগ প্রতিকারে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে দেখতে পারবেন।

Aphanomyces invaderi ছত্রাক দ্বারাআক্রান্ত মাছ পারিবেশিক প্রভাব ও অন্যান্য কারণের সংমিশ্রনে ক্ষতরোগের সৃষ্টি বলে এর প্রতিকার খুব জটিল।

নিঃসন্দেহে ক্ষতরোগ একটি মারাত্মক রোগ এবং স্বাদু পানির মাছ চাষে এ রোগ একটি প্রধান সমস্যা। দেশে বর্তমানে এ রোগের তীব্রতা এবং ব্যপকতা কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে কম পরিলক্ষিত হলেও এখন পর্যন্ত এ রোগ নির্মূল হয়নি। যেহেতু এ রোগের শুরুর কারণ এখন পর্যন্ত পরিস্কার ভাবে জানা যায় নি- তবে পারিবেশিক কারণে মাছের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে *Aphanomyces invaderi* নামক ছত্রাক রোগ জীবানুর আক্রমণের দ্বারা এ রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটে থাকে বলে অনেকেই বর্তমানে বিশ্বাস করছেন। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে ভাইরাস কিংবা *Aeromonas* sp. ব্যাকটেরিয়া একক বা যৌথ ভাবে এ রোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক নয় এ কথা এখনও পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়নি। সুতরাং রোগটির ঘটক বস্তু (Causative agent) এখন পর্যন্ত মিশ্র কারণ বলেই প্রতীয়মান- তাই সঠিক ভাবে প্রতিকার পদ্ধতি বলা মুশকিল। আমাদের দেশের বেশীরভাগ তথ্য অনুযায়ী শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (নভেম্বর- ফেব্রুয়ারী মাস) এ রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই সাধারণ- অবশ্য এর বাইরেও এ ধরনের রোগ কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে যে সকল প্রতিকার পদ্ধতির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ত নিম্নে বর্ণিত হল। প্রকৃতপক্ষে ক্ষত রোগের প্রতিকার করতে হলে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে-তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংক্রমন বন্ধ করা এবং শীতকাল আসার পূর্বেই পুকুরে চুন ও লবণ (প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে) দিয়ে সাবধান থাকা। এর পর নিয়মিত জাল টেনে পরীক্ষা করে দেখা দরকার মজুতকৃত মাছে কোন প্রকার ক্ষত চিহ্ন বা ঘা দেখা যাচ্ছে কি না। এ ছাড়া আশেপাশের এলাকার পুকুরে মাছের এ ধরনে কোন রোগ দেখা দিয়েছে কি না তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিকার করার একটি অসুবিধা হল *Aphanomyces invaderi* ছত্রাকটি কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে বিধায় কোন ঔষধ প্রয়োগ করলে উপরের ক্ষত বা ক্ষতের উপরিভাগে অবস্থিত ছত্রাকগুলো মারা গেলেও ভিতরের গুলো সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় এবং পরবর্তীতে আবার ক্ষতের সৃষ্টি করে।

চুনের ব্যবহার

রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে পানির পি.এইচ পরীক্ষা করে যদি প্রতিকূল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ৭ এর নীচে, তা হলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন $CaCO_3$ অথবা $CaMg(CO_3)_2$ প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। চুন দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই ভিজিয়ে নিয়ে সমস্ত পুকুরে সমভাবে যাতে চুন ছড়ানো যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে পানির অম্লীয় ভাব দূর হয় এবং অনেক রোগ জীবানু দমন হয়।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ ব্যবহার উত্তম চিকিৎসা হিসেবে পরিচিত। তবে অবস্থা অনুযায়ী পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এন্টিবায়োটিক বা ম্যালাকাইটগ্রীন দ্বারাও চিকিৎসা করানো যেতে পারে।

লবণের ব্যবহার

অনেকেই চুনের সাথে সমান অনুপাতে লবণ দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন- সেই হিসেবে চুনের সাথে সাথে প্রতি শতাংশে ১ কেজি লবণ পানিতে পূর্বেই গলিয়ে নিয়ে তা সারা পুকুরে ছড়িয়ে দিতে পারলে উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে ক্ষত রোগের প্রতিকারের জন্য লবণ ও চুন নিয়ে নানাবিধ গবেষণা করে বিভিন্ন অনুপাতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে-

যেমনঃ প্রতি শতাংশে (চুন + লবণ) ১ কেজি + ১ কেজি
১কেজি + ১/২কেজি পুকুরে প্রয়োগের জন্য।
১/২ কেজি + ১/২ কেজি

১/২ কেজি + ১ কেজি

যেহেতু চুন ও লবণ সহজ লভ্য এবং পুকুরে প্রয়োগের দ্বারা ভবিষ্যতে ক্ষতির আশংকা নেই তাই চুন ও লবণের ব্যবহারই বাংলাদেশে ক্ষত রোগের প্রতিকারে অধিকতর গ্রহনীয়। অবশ্য সীমিত সংখ্যক মাছে এ রোগ দেখা দিলে সে জন্য অন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা চিকিৎসা

পুকুরে প্রয়োগ ব্যয় বহুল তাই- আক্রান্ত মূল্যবান মাছকে ৫ পি.পি.এম দ্রবণে গোসল করালে উপকার পাওয়া যায়। তবে পাকা ট্যাংক বা ছোট পুকুরে বড় মাছ (মজুদকৃত) প্রজননের জন্য রাখা আক্রান্ত মাছকে চুন + লবণের সহিত ৩ পি.পি.এম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত করে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ম্যালাকাইট গ্রীন দ্বারা চিকিৎসা

আঘাত বা অন্য কোন প্রাথমিক পীড়নের দ্বারা মাছের শরীরে কোন ক্ষত দেখা দিলে শীতকালে তা ক্ষত রোগের আক্রমণের সহায়ক হয়। এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণত ছত্রাকের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এ সময় আক্রান্ত মাছকে ০.৫ পি.পি.এম থেকে ১ পি.পি.এম ম্যালাকাইট দ্রবণে ৫ মিনিট থেকে ১০ মিনিট কাল ডুবালে এ সকল আক্রমণের প্রতিকার পাওয়া যায়। পুকুরে ০.১৫ - ০.২০ পি.পি.এম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এন্টিবায়োটিকের মাধ্যমে চিকিৎসা

ক্ষতরোগের ক্ষেত্রে *Aphanomyces invaderi* নামক ছত্রাক রোগজীবানু হিসেবে সনাক্ত হলেও এরোগের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংশ্লিষ্ট থাকার কথা অনেক বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন। কাজেই রোগের প্রাদুর্ভাব হলে কিছু এন্টিবায়োটিক খাবারের মাধ্যমে মাছে প্রয়োগ করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা টেরামাইসিন প্রতি কেজি মাছের জন্য ৭৫ মি.গ্রাম প্রত্যহ খাবারের সংগে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর্যন্ত খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। যা হউক ক্ষত রোগের প্রতিকার একটি জটিল ব্যাপার। উত্তম প্রতিকারের জন্য পূর্ব থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও এক সংগে চালিয়ে যেতে হবে।

***অনুশীলন (Activity):** কীভাবে ক্ষত রোগের প্রতিকার করা যায় তা সংক্ষেপে লিখুন।*

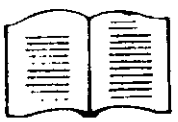

সারমর্ম ঃ ক্ষত রোগ স্বাদু পানির মাছের একটি মারাত্মক রোগ। বিভিন্ন মৎস্য খামার সহ পুকুর, খাল, বিলের প্রায় সব ধরনের মাছেই এর মড়ক লক্ষ্য করা গেছে। তবে বন্য মাছ হিসেবে শোল, টাকী, পুঁটি মাছ এবং চাষকৃত মাছের মধ্যে মৃগেল, রুই ইত্যাদিতে এ রোগের প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। পানির পরিবেশ শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু পরিবর্তন হওয়ার ফলে *Aphanomyces invaderi* নামক ছত্রাক মাছের কোষের অভ্যন্তরে আক্রমণের ফলে ক্রমশঃ ক্ষতের সৃষ্টি করে ফলে মাছের মৃত্যু ঘটে থাকে। তাৎক্ষনিক ভাবে মড়কের প্রতিকার করা বেশ কঠিন। পূর্ব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করলে বিশেষ করে পানির পরিবেশ ভাল রাখা এবং অন্য কোন স্থান থেকে সংক্রমন যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া। শীতের শুরু থেকে পুকুরে নিয়মিত মাছ পর্যবেক্ষন করে প্রতি শতাংশে ১/২ কেজি লবণ ও ১/২ কেজি চুন প্রয়োগ করলে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। এ ছাড়া দু-একটি মাছে রোগ (ক্ষত) দেখা দিলেই চুন ও লবণের পরিমাণ বাড়িয়ে দু-সপ্তাহ অন্তর প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ দিতে হবে। অনেকে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ম্যালাকাইট গ্রীন বা এন্টিবায়োটিকের উপদেশ দিয়ে থাকেন তবে প্রকৃত পক্ষে তা তত কার্যকর নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন**

ক) ক্ষত রোগের প্রতিকারের জন্য বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের নাম কি?

i) ম্যালাকাইট গ্রীন
ii) এন্টিবায়োটিক
iii) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট
iv) চুন
v) লবণ
vi) লবণ ও চুন

খ) ক্ষত রোগের রোগ জীবানু হিসেবে বর্তমানে কোনটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে?

i) *Aeromonas* sp.
ii) *Aphanomyces invaderi*
iii) *Saprolegnia parasitica*
iv) *Rhabdovirus*

২। **সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।**

ক) ক্ষতরোগে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার খারাপ।
খ) চুন প্রয়োগে পানির অম্লীয়ভাব দূর হয়।

৩। **এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক) ক্ষত রোগের প্রতিকার কঠিন কেন?
খ) ক্ষত রোগ আক্রান্ত মাছে কি করতে উপদেশ দেওয়া যায়?

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৪ মাছের রোগ দমনে চুন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ম্যালাকাইট গ্রীন, এন্টিবায়োটিক ইত্যাদির ব্যবহার

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের রোগ দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন।
- রোগ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জিনিষ পত্রের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- মাছের রোগ দমনে চুন ও লবণের ব্যবহার নিজেই করতে পারবেন।
- পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও ম্যালাকাইট গ্রীনের পরিমাপ নির্ণয় করে তা মাছের রোগ দমনে
- প্রয়োগ করতে পারবেন।
- প্রয়োজনে মাছকে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের দ্বারা চিকিৎসা করতে পারবেন।

মাছের রোগ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

রাসায়নিক দ্রব্যাদিঃ

(১) চুন- পাথুরে চুন, $Ca\ CO_3$ অথবা কুইক লাইম বা পোড়া চুন, CaO অথবা কলিচুন, $Ca\ (OH)_2$ । তবে মূল্য হিসাবে পাথুরে চুন সুবিধাজনক।

চিত্র ১৫ : পাথুরে চুন

(২) লবণ- খাদ্য লবণ (NaCl) তবে মূল্য কম যা পরিশোধিত না হলেও চলবে।

(৩) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট $KMnO_4$ - কমার্শিয়াল বা বাজারে বিক্রিত পাউডার বা দানাদার।

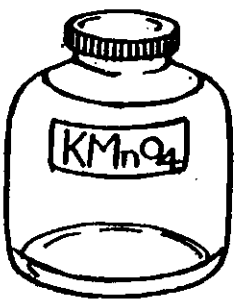

চিত্র ১৬ : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

(৪) ম্যালাকাইট গ্রীন- কমার্শিয়াল, দানাদার বা পাউডার।

চিত্র ১৭ : ম্যালাকাইট গ্রীন

(৫) এন্টিবায়োটিক- অক্সিটেট্রাসাইক্লিন - অতি সাধারণ তবে বহুল ব্যবহৃত এবং কার্য্যকরী। বর্তমানে একুয়াকালচার করার জন্য কমার্শিয়ালভাবে বিক্রয় হচ্ছে। উদাহরণসরূপ: ARGENT AQUACULTURE এ ছাড়া বাজার থেকে ক্যাপসুল কিনে তা ব্যবহার করা যেতে পারে তবে তা ব্যয় বহুল হবে। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন না পেলে টেরামাইসিন ব্যবহার করা যাবে।

চিত্র ১৮ : অক্সিটেট্রাসাইক্লিন

সতর্কতাঃ উপরিউল্লিখিত ঔষধ গুলো ব্যবহারের পূর্বে এবং ক্রয় করার পূর্বে কার্য্যকরী তারিখ অবশ্যই দেখে নিতে হবে যাতে পুরান কিংবা কার্য্যকারীতার তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে এমন যেন না হয়।

পরিমাপ করার উপকরণ

(১) রাসায়নিক দ্রব্যাদি/ঔষধ পরিমাপ ও তার উপকরণ

রাসায়নিক দ্রব্যাদি/ঔষধের পরিমাপের জন্য একটি সাধারণ ব্যালান্স(৫০০ গ্রাম থেকে ২০ কেজি পর্যন্ত ওজন মাপার জন্য), 2-প্যান বিশিষ্ট ব্যালান্স (৫ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত ওজন মাপার জন্য) ও একটি ইলেকট্রনিক ব্যালান্স (সূক্ষ্ম ওজন নেয়ার জন্য, ০.১ মি.গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত ওজন নেয়া যেতে পারে) প্রয়োজন।

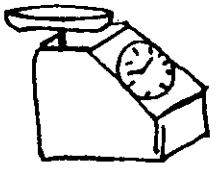

চিত্র ১৯: সাধারণ ব্যালান্স

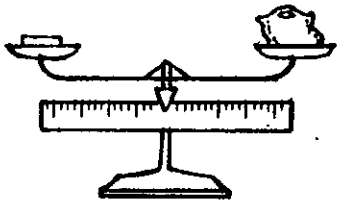

চিত্র ২০ : দুই প্যান বিশিষ্ট ব্যালান্স

চিত্র ২১: ইলেকট্রনিক ব্যালান্স

(২) পানির পরিমাপ ও তার উপকরণ

- ১ লিটার পর্যন্ত পরিমাপ করার প্লাষ্টিক জ্যার

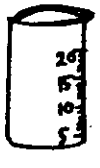

চিত্র ২২ : পরিমাপ জার

- ১ লিটার থেকে ১০ লিটার পানি মাপার জন্য ১টি বালতি যা দাগ কেটে চিহ্নিত করে নিতে হবে।

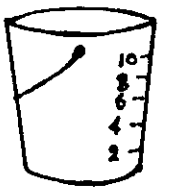

চিত্র ২৩ : পরিমাপ বালতি

উপকরণ গুলো যেমন ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি, পরিমাপের উপকরণ, ঔষধ প্রয়োগের উপকরণ সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে।

পুকুরের পানি পরিমাপ করার জন্য পানির উপরিভাগের গড় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পানির গভীরতার ৭-৮ টি রিডিং নিয়ে গড় গভীরতা দিয়ে গুণ করলে পানির আয়তন পাওয়া যায়। এ সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করাই শ্রেয় যা ঔষধ প্রয়োগের মাত্রা ঠিক করা সহজতর হবে। এজন্য একটি মিটার টেপ ও একটি মিটার স্কেল (৫ মি.-৭ মি.) প্রয়োজন।

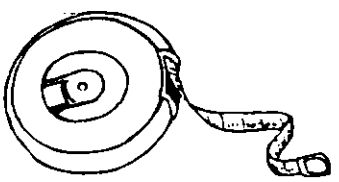

চিত্র ২৪ : ৫০ মিটার টেপ

চিত্র ২৫ : স্কেল

পানির আয়তন = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ্য × গভীরতা) গড়

প্রতি ঘন মিটার আয়তন পানির পরিমাণ ১০০০ লিটার

অবশ্য পুকুরটি গোলাকৃতি হলে তার আয়তন : $\pi r^2 h$

= ৩.১৪ × পানির উপরি ভাগের ব্যাসার্ধ্য (r) × গভীরতা (h)

অন্যান্য উপকরণ

(১) পুকুরে ঔষধ/ চুন/ লবণ দিতে হলে সকল স্থানে সমভাবে পড়ে তার জন্য একটি ছোট্ট নৌকা বা ভেলা প্রয়োজন।

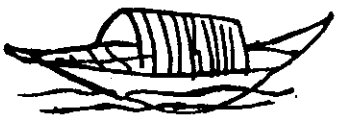

চিত্র ২৬ : নৌকা

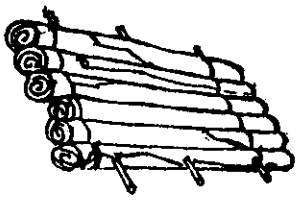

চিত্র ২৭ : ভেলা

(২) চুন ভিজানো পাত্র, ঔষধ তৈরির পাত্র, প্রয়োজনীয় ছোট, বড় প্লাষ্টিক বালতি।
(৩) স্প্রে- মেশিন/বা ঔষধ ছিটানোর পাত্র

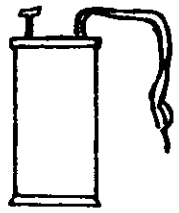

চিত্র ২৮ : স্প্রে মেশিন

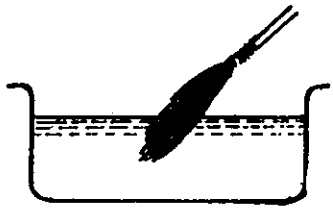

চিত্র ২৯ : ঔষধ ছিটানোর পাত্র

(৪) মাছকে খাবারের মাধ্যমে ঔষধ দেওয়ার জন্য কিছু গামলা (ছোট ও বড়) প্রয়োজন।

চিত্র ৩০ : গামলা

(৫) কোন কোন সময় মাছকে ইনজেকশনের দ্বারা ঔষধ ব্যবহার করতে হয় তার জন্য ৫ মি.লি., ও ২ মি.লি. সিরিন্জ দরকার।

চিত্র ৩১ : সিরিন্জ

(৬) কোন কোন সময় পানির pH মাপার জন্য pH মিটার (যা মাঠে বহন করা সহজ) প্রয়োজন যার দ্বারা পুকুরের পানি ক্ষারীয় বা অম্লীয় তা নিরীক্ষা করা যায়। এর উপর ভিত্তি করে চুন বা লবণ প্রয়োগ করতে হয়।

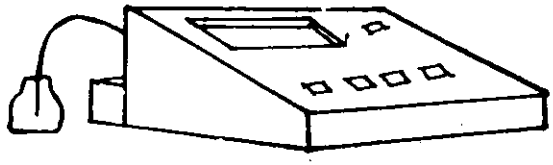

চিত্র ৩২ : মাঠে ব্যবহার উপযোগী pH মিটার

(৭) পানির অক্সিজেন পরিমাপের জন্য মাঠে ব্যবহার উপযোগী একটি অক্সিজেন মিটার প্রয়োজন।

চিত্র ৩৩ : অক্সিজেন মিটার

(৮) পানির তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য ০°C - ১০০°C পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায় এমন একটি থার্মোমিটার অবশ্যই রাখতে হবে।

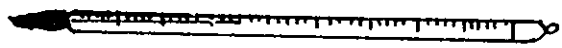

চিত্র ৩৪ : থার্মোমিটার

(৯) জাল : টানা জাল (বেড় জাল) ও খেপলা জাল রাখতে হবে। মাছের নমুনা সংগ্রহের জন্য।

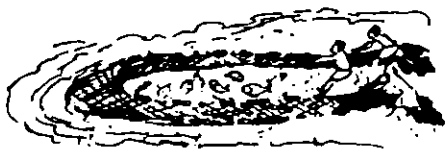

চিত্র ৩৫ : টানা জাল

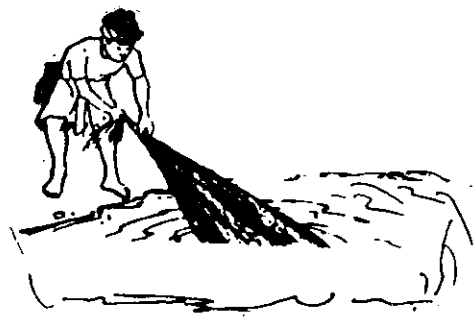

চিত্র ৩৬ : খেপলা জাল

চুন ও লবণের প্রয়োগ পদ্ধতি

চুন ও লবণ ব্যবহারের পূর্বে পুকুরের পানির পি. এইচ. অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে। পি. এইচ. ৮ এর উপরে থাকলে চুন দেওয়া ঠিক হবেনা। আবার পি.এইচ. ৬ এর নীচে থাকলে লবণ না দেওয়াই ভাল। এরই উপর ভিত্তি করে চুন ও লবণ আলাদা ভাবে পূর্বেই দ্রবন তৈরি করে তা পুকুরে নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হবে। যেমন ক্ষত রোগের জন্য চুন ও লবণ একই সংগে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। উভয়ের মাত্রা ১.৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পানিতে প্রতি শতাংশে ১/২- ১ কেজি হারে চুন ও লবণ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

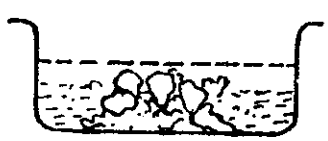

চিত্র ৩৭ : চুন ভিজানো

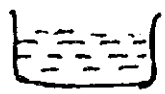

চিত্র ৩৮ : লবণ দ্রবণ

চিত্র ৩৯ : পুকুর

এ ছাড়া স্বল্প সংখ্যক রোগক্রান্ত মাছকে ১-২ % লবণ দ্রবণে সহ্য করার সময় পর্য্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে।

১ % লবণ = ১০ গ্রাম লবণ/ ১ লি. পানি

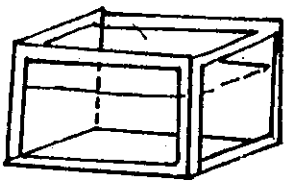

চিত্র ৪০ : পাত্র বা এক্যুরিয়াম

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ব্যবহার

পানিতে অক্সিজেন কম হলে, কিংবা ব্যাকটেরিয়া বা প্রোটোজোয়াজনিত রোগ হলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষত রোগের ক্ষেত্রে অনেকে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আক্রান্ত মাছকে ৫ পি.পি.এম (৫ মি.গ্রাম/ লিটার) দ্রবণে সহ্য করার সময় পর্য্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে। এ ছাড়া পুকুরে প্রয়োগের জন্য আলাদা দ্রবণ তৈরি করে তা পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে করে পুকুরে এর পরিমাণ ২ পি.পি.এম থেকে ৩ পি.পি.এম হয়। জাল টেনে সমভাবে বিস্তরণের ব্যবস্থা করা ভাল।

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ম্যালাকাইট গ্রীন অথবা এন্টিবায়োটিক যাই প্রয়োগ করা হউক তা এদের মাত্রা সঠিক ভাবে মেপে প্রয়োগ করতে হবে।

ম্যালাকাইট গ্রীনের ব্যবহার

ছত্রাক জাতীয় রোগ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত মাছকে ০.৫ পি.পি.এম থেকে ১ পি.পি.এম দ্রবনে ৫-১০ মিনিট ডুবালে আরোগ্য লাভ করে। পুকুরে ০.১৫-০.২০ পি.পি.এম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরে প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুকুরের পানির পরিমাণ নির্ণয় করার পর সর্বমোট প্রয়োজনীয় পরিমাণ ম্যালাকাইট গ্রীনের পাওডার বা ক্রীষ্টাল মেপে তা একটি পাত্রে ঘন দ্রবণ করে নেন। পরে তা পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিয়ে জাল হালকাভাবে টেনে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার

সাধারণত: ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিকারের জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। মাছের রোগের ক্ষেত্রে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (টেরামাইসিন) অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে এখনও এন্টিবায়োটিক অন্যান্য উন্নত দেশের চেয়ে খুব কমই ব্যবহৃত হয়। সেই হিসাবে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন মাছ বা চিংড়ির রোগ দমনে বেশ কার্য্যকর। এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ পদ্ধতি হিসাবে খাদ্যের সংগে ব্যবহার করাই উত্তম। এর জন্য প্রত্যহ মোট কত কেজি মাছের জন্য খাবার দেওয়া হচ্ছে তা বের করে সেই হিসাবে খাবারের সংগে মিশিয়ে তা প্রয়োগ করতে হবে। ধরা যাক- একটি পুকুরে ছোট-বড় মাছ মোট ৩০০০ রয়েছে- যার ওজন গড়ে ১০০০ কেজি। তাহলে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন সকল মাছকে চিকিৎসার জন্য প্রতি কেজি মাছের জন্য ৭৫ মি.গ্রাম হিসেবে ৭৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রত্যহ প্রয়োজন যা ৭-১০ দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে। এটা ব্যয়বহুল বিধায় আক্রান্ত মাছকে আলাদা করে ছোট ট্যাংকে প্রয়োগ করা আর্থিক সহায়ক। এ ছাড়া বড় বড় মাছ আক্রান্ত হলে ইনজেকশনের মাধ্যমে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ খুবই কার্য্যকর।

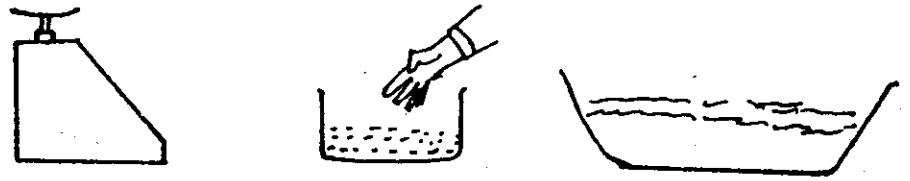

ক) এন্টিবায়োটিকের ওজন নেয়া (খ) খাবারের মিশ্রণ (গ) খাদ্যের মাধ্যমে পুকুরে প্রয়োগ

চিত্র ৪১ : খাদ্রের মাধ্যমে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ

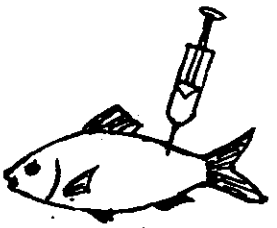

চিত্র ৪২ : ইনজেকশনের মাধ্যমে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ

চিত্র ৪৩ : পোনা মাছকে এন্টিবায়োটিক দ্রবণে গোসল করানো

এজন্য আগে এন্টিবায়োটিক সাসপেনশন তৈরি করে ১০০ মি.গ্রাম/প্রতি কেজি মাছের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া ছোট মাছ বা পোনা মাছকে আলাদা করে ছোট ট্যাংক বা একোরিয়ামে ২০-৩০ পি.পি.এম দ্রবণে ১ঘন্টা কালীন গোসল করালে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং বহন কৃত রোগ জীবানু (ব্যাকটেরিয়া) আর ক্ষতি করতে পারে না।

অনুশীলন *(Activity) : কীভাবে মাছের রোগ দমন করার জন্য চুন, লবণ, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ম্যালাকাইট গ্রীন এবং এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন তা লিপিবদ্ধ করুন।*

সারমর্ম ঃ চুন ও লবণ ক্ষত রোগ সহ অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আলাদাভাবে ভিজিয়ে তা পুকুরে ১/২ -১ কেজি হারে এক সংগে বা আলাদা ভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে পানির পি.এইচ. গুরুত্বপূর্ণ। আক্রান্ত মাছকে ১-২% লবণ দ্রবণে আলাদা ভাবে চিকিৎসা করানো যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঔষধের মাত্রা মাছ ও পানির পরিমাণ অনুযায়ী ঠিক করা প্রয়োজন। কার্য্যকরী তারিখ পার হওয়া কোন ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ম্যালাকাইট দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে গোসল করানো যায়। আবার এ গুলো কম মাত্রায় পুকুরে ব্যবহার করা যায়। এন্টিবায়োটিক হিসেবে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের জন্য খুবই কার্যকর যা খাদ্যের সহিত ব্যবহার করা উত্তম। প্রয়োজনে ইনজেকশন বা গোসল করিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন।

ক) পুকুরে পাথুরে চুন ব্যবহারের নিয়ম কি ?

i) সরাসরি দিতে হয়।
ii) গুঁড়া করে ছিটিয়ে দিতে হয়।
iii) পূর্বেই পানিতে ভিজিয়ে তারপর প্রয়োগ করতে হয়।
iv) এক জায়গায় রেখে দিতে হয়।

খ) ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে কী সতর্কতা নিতে হবে ?

i) মাত্রা ঠিক কি-না
ii) কার্যকরী তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে কি-না
iii) মাছ রোগাক্রান্ত কি-না
iv) পরিবেশ ঠিক আছে কি-না

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ---------- পুকুরের পানি পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ।
খ) ইনজেকশনের মাধ্যমে সাধারণত ---------- ওষুধ মাছে প্রয়োগ করা হয়।

৩। অল্প কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক) পানির ক্ষরীয় বা অম্লীয় অবস্থা নিরীক্ষর জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
খ) অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিকের পরিবর্তে অন্য কোন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। মৎস্য চাষে রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য কী? রোগ প্রতিরোধ করার নিয়মগুলো বর্ণনা করুন।
২। রোগ দমন ও প্রতিরোধের পার্থক্য কী? মৎস্য উৎপাদনে রোগ দমনের নিয়মাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩। মাছে পরজীবী জনিত রোগের প্রতিকার বর্ণনা করুন।
৪। বাংলাদেশে ছত্রাক জনিত সাধারণ মৎস্য রোগগুলো কী কী? কী ভাবে এদের প্রতিকার করা যায় তা লিখুন।
৫। মাছ ও চিংড়ির ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের প্রতিকার গুলো বর্ণনা করুন।
৬। মৎস্য ও চিংড়ি চাষে ভাইরাস ঘটিত রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৭। ক্ষত রোগের প্রধান রোগ জীবাণু কী? বাংলাদেশে ক্ষত রোগের প্রতিকার সাধারণত: কী ভাবে করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৮। মাছের রোগ দমনের জন্য অতি সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা ঔষধ গুলোর একটি তালিকা দিন। মৎস্য রোগ দমনে পুকুরে কীভাবে চুন ও লবণ ব্যবহার করা হয় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।
৯। একটি পুকুরের পানির পরিমাণ কীভাবে নির্ণয় করবেন? পুকুরে ২ পি.পি.এম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১০। স্বল্পসংখ্যক রোগাক্রান্ত মাছের প্রতিকার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

১। ক) iv খ) ii
২। ক) স. খ) মি.
৩। ক) সাদা দাগ রোগ খ) ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ গ) সমুদ্রের
৪। ক) Chemo therapy খ) ভ্যাক্সিন

পাঠ ৪.২

১। ক) ii খ) iv
২। ক) স. খ) মি.
৩। ক) এককোষী খ) মিঠাপানির
৪। ক) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ খ) Systemic Ectodermal Mesodermal Baculo virus

পাঠ ৪.৩

১। ক) vi খ) ii
২। ক) মি খ) স
৩। ক) রোগজীবাণু কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে খ) খাওয়া যায় তাই বাজারজাত করা যেতে পারে

পাঠ ৪.৪

১। ক) iii খ) ii
২। ক) মিটারটেপ ও মিটার স্কেল খ) এন্টিবায়োটিক
৩। ক) পি,এইচ মিটার খ) টেরামাইসিন